যুগান্তর

তারিখ 22 SEP 2007
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

ড. বদিউল আলম মজুমদার

এ বিপর্যয় থেকে শিক্ষাকে উদ্ধার করতে হবে

এ কথা আজ বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে একটি প্রলয়ংকরী বিপর্যয় ঘটে গেছে। অনেকের অভিযোগ, সর্বস্তরের শিক্ষার, বিশেষত সরকারি শিক্ষার মানে ব্যাপক ধস নেমেছে। উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আজ অনেক ক্ষেত্রে মেধাশূন্যতায় ভুগছে ও দলবাজির আখড়ায় পরিণত হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এগুলো রণক্ষেত্রের রূপ নিয়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা শুধু দলাদলিতেই লিপ্ত নন, তারা আমলাতেও পরিণত হয়েছেন। এ অবস্থা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রায় ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে।

শিক্ষা খাতের এ নাজুক অবস্থার পেছনে অনেক জটিল কারণ রয়েছে। তবে নীতিনির্ধারণে ভ্রান্তি একটি বড় কারণ বলে অনেকের ধারণা। স্বাধীনতা-পরবর্তীকাল থেকেই আমরা কতগুলো মারাত্মক ভুল করে আসছি, যার মাশুল জাতি হিসেবে আজ আমাদের গুনতে হচ্ছে। আর এ ভুলের জন্য দল-মত নির্বিশেষে অনেকেই দায়ী।

অনেকের মতে, স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের একটি ভুল পদক্ষেপ ছিল ১৯৭৩ সালে প্রণীত 'বিশ্ববিদ্যালয় আইন'। এমনকি তৎকালীন আইনমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন এ আইন প্রণয়ন করে ভুল করেছেন কিনা তা নিয়ে সম্প্রতি নিজেই প্রশ্ন তুলেছেন। এ আইনের লক্ষ্য ছিল দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করা। আশা করা হয়েছিল, স্বায়ত্তশাসনের অংশ হিসেবে আমাদের সম্মানিত শিক্ষকরা তাদের প্রজ্ঞা ও সর্বোচ্চ বিবেচনাশক্তি কাজে লাগিয়ে নিজেরাই উপাচার্য থেকে শুরু করে অন্যান্য একাডেমিক পদে সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তিদের নির্বাচিত করবেন। এটি ছিল একটি নোবেল বা অনন্য এক্সপেরিমেন্ট। দুর্ভাগ্যবশত এ স্বায়ত্তশাসন আজ আমাদের জন্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বায়ত্তশাসনকে কাজে লাগিয়ে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আজ রাজনৈতিক দলের ক্ষমতার লড়াইয়ের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। আমার সাবেক সহকর্মীদের অনেকেই— আমি নিজেও এককালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলাম— আজ সাদা-নীল রঙের খেলায় মত্ত হয়েছেন।

গুরুত্বপূর্ণ একাডেমিক পদের নির্বাচনের বিরূপ প্রভাব শিক্ষক নিয়োগে ভয়াবহভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অনেক বিভাগেই এখন শিক্ষক নিয়োগের পরিবর্তে ভোটার নিয়োগ করা হয়, এই লেখকের অতি ঘনিষ্ঠজনও যার নগ্ন শিকার। এছাড়াও রাজনৈতিক প্রভুদের সন্তুষ্ট করতে অযোগ্য দলীয় ব্যক্তিদের নিয়োগ দেয়া হয়। যোগ্য ব্যক্তিদের অন্যায়ভাবে নিয়োগ না দেয়া, সরকারি কর্মকমিশনের প্রধান ড. সাদত হোসেনের ভাষায়, তাদের হত্যা করার শামিল। এ অপরাধের দায় কি বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষক এড়াতে পারবেন?

নিঃসন্দেহে শিক্ষক নিয়োগে দলবাজি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ক্রমাগতভাবে মেধাশূন্য করার ব্যাপারে বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। নামকাওয়াস্তে কিছু গবেষণাপত্র প্রকাশের শর্ত জুড়ে দিয়ে চাকরির মেয়াদকে প্রধান বিবেচনা হিসেবে গণ্য করে শিক্ষকদের প্রায় স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে পদোন্নতি প্রদান মেধাশূন্যতা সৃষ্টির আরেকটি বড় কারণ। জ্ঞান বিতরণের পাশাপাশি গবেষণার মাধ্যমে জ্ঞান সৃষ্টি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মৌলিক দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এখনও অনেক নিবেদিত শিক্ষক ও গবেষক থাকলেও, মানসম্মত গবেষণাকর্মে নিয়োজিত শিক্ষকের সংখ্যা ক্রমাগতভাবে কমে যাচ্ছে বলে অনেকেরই অভিযোগ। সঙ্গত কারণেই তা ঘটছে— বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পদে আসীন হওয়ার জন্য এখন আর পাণ্ডিত্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ যোগ্যতা নয়, দলীয় আনুগত্যই অনেকক্ষেত্রে প্রধান বিবেচ্য।

১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আইন গুরুতর নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করলেও এটি অত্যন্ত মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই প্রণীত হয়েছিল। তবে এটি উচ্চ শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতিবিদদের দলীয় প্রভাব সৃষ্টির একটি সুযোগ তৈরি করে দেয়। অধিকাংশ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের একশ্রেণীর শিক্ষক এ সুযোগ কাজে লাগালেও এর ব্যতিক্রমও রয়েছে। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এমনি একটি ব্যতিক্রম— এ প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত শিক্ষকরা দলীয় রাজনীতি থেকে নিজেদের দূরে রেখেছেন। পদ্ধতির ত্রুটির কারণে ব্যক্তির চারিত্রিক দুর্বলতা অন্য প্রতিষ্ঠানগুলোতে সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

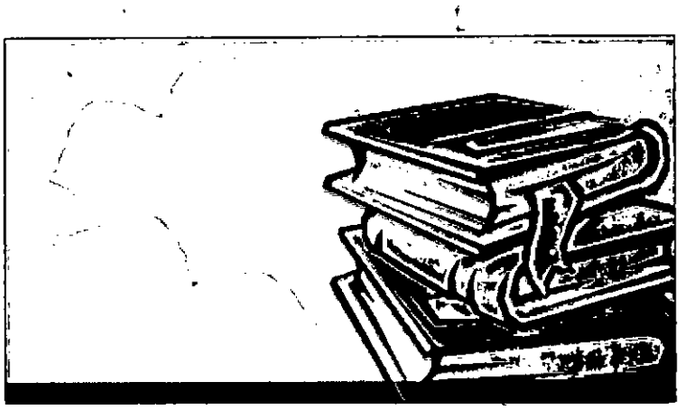

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে একটি বড় আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত ছিল ঢালাওভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর জাতীয়করণ। যদিও এটি ছিল একটি পপুলিস্ট বা জনপ্রিয় সিদ্ধান্ত, এর ফলে শিক্ষকরা রাতারাতি আমলায় পরিণত হন এবং তাদের স্থানীয় দায়বদ্ধতা বহুলাংশে অবসান ঘটে। তারা মূলত দায়বদ্ধ হয়ে পড়েন তাদের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছে। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের সরকারি দায়বদ্ধতার কাঠামোটি প্রায় ভেঙে পড়েছে। কিন্তু অবিবেচনাপ্রসূত জাতীয়করণের ফলে আমাদের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার মানে ব্যাপক ধস নেমেছে। এছাড়াও পুরো শিক্ষা ব্যবস্থায়ই আমলাতন্ত্রের বেড়াজালে আটকা পড়ে গেছে। প্রসঙ্গত, সরকারি কোষাগার থেকে শিক্ষকদের বেতন-ভাতা দেয়ার পক্ষে আমরা, কিন্তু তাদের আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ করার বিপক্ষে, যা ইতিমধ্যেই আমাদের অপূরণীয় ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার কফিনে একটি বড় পেরেক মারা হয় বিগত জোট সরকারের আমলে, মাননীয় সংসদ সদস্যদের এবং তাদের প্রতিনিধিদের বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি করার মাধ্যমে। এর ফলে এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দলবাজি ও দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়। শিক্ষার মান, বিশেষত গ্রামীণ শিক্ষার মান অবনতির এটি আরেকটি বড় কারণ।

গ্রামীণ শিক্ষার মান অবনতির পরিণতি অত্যন্ত মারাত্মক। এর ফলে কোটি কোটি গ্রামীণ ছেলেমেয়ের বিকাশের পথ প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে এবং তারা উচ্চ শিক্ষা থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় সব ক্ষেত্রে বঞ্চিত হচ্ছে। ঐতিহাসিকভাবে শিক্ষাই ছিল দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে আসার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সিঁড়ি। আমি নিজেও এই সিঁড়ি বেয়েই দারিদ্র্যের শৃংখলমুক্ত হতে পেরেছি। দুর্ভাগ্যবশত এই সিঁড়ি আজ আকেজো হয়ে পড়েছে এবং অসংখ্য গ্রামীণ পরিবার আজ দারিদ্র্যের ফাঁদে আটকা পড়ে গেছে।

উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে দলবাজির আখড়া এবং রণক্ষেত্রে পরিণত করার আর একটি বড় কারণ হল, পলিটিক্যাল পার্টিজ রেগুলেশন ১৯৭৬। জেনারেল জিয়াউর রহমানের আমলে প্রণীত এই রেগুলেশনে রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞায় অঙ্গসংগঠনগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রফেসর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী সম্প্রতি এক সেমিনারে দাবি করেন, তিনি এবং অন্য পাঁচজন উপাচার্যের বিরোধিতা সত্ত্বেও জেনারেল জিয়া তা করেন। এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আমাদের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে অঙ্গসংগঠনই শুধু গড়ে তোলেনি, এগুলোকে পুরোপুরি লেজুড়ে পরিণত করেছে। যেমন— এসব অঙ্গসংগঠনগুলোর মূল দলের নিয়ন্ত্রণের বাইরে একচুল পরিমাণও যাওয়ার ক্ষমতা নেই। তাই ছাত্র সংগঠনগুলো এখন রাজনৈতিক দলের এজেন্ডা বাস্তবায়নেই মূলত কাজ করে, শিক্ষার্থীদের স্বার্থে নয়।

পরিশেষে, এটি প্রায় সর্বজনস্বীকৃত যে, শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের একটি মহাবিপর্যয় ঘটে গেছে। বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগের দেশ হলেও এ মহাবিপর্যয় প্রাকৃতিক কারণে ঘটেনি, এটি মানব সৃষ্ট, নিজেরাই আমরা এর জন্য দায়ী। নীতি-নির্ধারণে ভ্রান্তির জন্যই তা বহুলাংশে ঘটেছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটাতে হলে আজ পদ্ধতির পরিবর্তন দরকার। একই সঙ্গে দরকার ব্যক্তির শুদ্ধি। ব্যক্তির শুদ্ধি নিশ্চিত করার মতো কোন মহাযৌধ কারও কাছেই নেই। তবে বিদ্যমান আইনি কাঠামো সংস্কারের মাধ্যমে পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটালেই ব্যক্তির আচরণে পরিবর্তন ঘটতে বাধ্য। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে বিপর্যয় ঠেকাতে হলে আজ আমাদের পদ্ধতির সংস্কারের দিকে নজর দেয়া জরুরি। তবে এ সংস্কারের উদ্দেশ্য যেন কোনভাবেই কালাকানুনমূলক সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা না হয়। এছাড়াও জ্ঞানপিপাসু শিক্ষকরা যেন সম্মানজনকভাবে জীবিকা নির্বাহ করতে পারেন, তাও নিশ্চিত করতে হবে।

ড. বদিউল আলম মজুমদার : *সম্পাদক, সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক*